International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN: **3049-2017**
IJMH 2026; 3(2): 62-64
© 2026 IJMH
www.themultijournal.com

Received: 07-03-2026
Accepted: 17-03-2026
Publish : 18-03-2026

Parsi Hansda
M.A in Bengali,
Vidyasagar University,
West Bengal, India

Correspondence:
Parsi Hansda
M.A in Bengali,
Vidyasagar University,
West Bengal, India

ধর্মমঙ্গল কাব্য মধ্যযুগীয় সমাজ তথা দেশকালের দস্তাবেজ-একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা

Parsi Hansda

Abstract: মধ্যযুগীয় সাহিত্যের উত্থানের ইতিহাস ইসলামী রাজবংশের পরিবর্তনের সাথে জড়িত। মধ্যযুগীয় সাহিত্য রচনার সূচনা হয়েছিল যখন মুসলিম শাসন শুরু হয়। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে যেমন শাসকের পরিবর্তন হয় তেমনি সাহিত্যেও নানা পরিবর্তন আসে। মুসলিম শাসনের সূচনালগ্নে 'মনসামঙ্গল' কাব্যের দেবতা ছিলেন অত্যন্ত ক্রুর এবং প্রতিশোধ পরায়ণ। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের দেবতা 'চন্ডী'-কে শান্ত দেখায়। সে মনসার মতো ক্রুর নয়। এরপর মধ্যযুগের শেষের দিকে 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য রচনা প্রারম্ভ হয়। অষ্টাদশ শতকে নবাবী শাসনকালে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামোতে বিস্তর পরিবর্তন আসে। আবার কোম্পানীর শোষনের ফলে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বাংলার মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যেতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে বাংলার মানুষের ধর্মীয় জীবনে পরিবর্তন আসে। যার প্রতিফলন 'ধর্মমঙ্গল', 'শিবায়ণ' কাব্যে দেখা যায়। বর্তমান প্রবন্ধটিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমকালীন সময়ের সমাজ সংস্কৃতি, জীবনচর্চা, সমাজ ইতিহাসে যে পরিবর্তন এসেছিল, সেই পরিবর্তিত দিকগুলি 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের কবিগণ কতখানি সার্থকতার সহিত তুলে ধরেছেন তা আলোচনা করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

Keywords - আখ্যান, মাহাত্ম্য, অনার্য, দুর্ভিক্ষ, লাউসেন, নগন্য।

ভুমিকা: আধুনিক পূর্ব বাংলা সাহিত্য মূলত দেবকেন্দ্রিক। তবে ব্যতিক্রম অবশ্য ছিল। যেমন- সপ্তদশ শতকের মুসলমান কবিদের দ্বারা রচিত গ্রন্থ সমূহ। তবে আধুনিক পূর্ব বাংলা সাহিত্যের বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে এটি অতি নগন্য। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তু মূলত দেবকেন্দ্রিক হলেও এতে সমাজের সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, ভাল-মন্দ, উত্থান-পতন ইত্যাদি প্রাধান্যতাও পেয়েছে। আসলে দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা যেন উপরি আবরণ। এই আবরণটিকে খসিয়ে দিলেই দেখা যাবে সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবন কাহিনী। তবে মধ্যযুগের বাংলা কাব্যসাহিত্যের পরিমন্ডলে মানুষের বাস্তব জীবনের সার্বিক পরিচয় প্রদানে অগ্রণি ভূমিকা পালন করে মঙ্গলকাব্য।

মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব এবং বিকাশ মূলত হয়েছিল এক রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক পরিস্থিতিতে। একেবারে সূচনালগ্নে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের দৈববিশ্বাস তথা অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী মানুষের মধ্যে এই মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন-দেবী চন্ডী নিয়ে বলা হয়েছে যিনি অনার্যদের দেবী 'চান্ডী' রূপে পূজ্য ও যিনি পশুদের রক্ষয়িত্রী, তিনিই মঙ্গলকাব্যে কবিদের কাছে ব্যাধ সমাজে পূজিত 'চন্ডী' রূপে ধরা দিয়েছেন। আবার কখন্ও দ্বিজমাধবের কাব্যে 'সারদা' তো মুকুন্দের কাব্যে 'অভয়াচন্ডী' রূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

এই অনার্য লৌকিক সমাজ থেকেই মঙ্গলকাব্যের দেব দেবীর উদ্ভব। পূজা প্রচার, পূজা পদ্ধতি, লোকবিশ্বাস, সংস্কার, আচার-আচরণ, মানসিকতা সব্ই অনার্য সমাজ থেকে উদ্ভূত। তৎকালীন সমাজ নিয়ে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন – "এমনি করিয়া উপদ্রুত অসহায় কৃষিসমাজ, নিম্নবর্ণ এবং স্ত্রীমন্ডল ভয়ে-ভক্তিতে মনসার ভাসান গাহিয়াছে, চন্ডীর মঙ্গলগান বাঁধিয়াছে, রঞ্জাবতী-লাউসেন-কানাড়া-কলিঙ্গার অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়াছে। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের পটভুমিকায় রহিয়াছে একটি বিশাল গ্রামকেন্দ্রিক জল – জঙ্গল - পরিবেষ্টিত নদীমাতৃক বাঙলা - দেশ যেখানে অষ্টিক নরগোষ্ঠীর লোক্ই প্রধান, যাহারা-শিক্ষা সভ্যতায় পুরাপুরি আর্যত্ব লাভ করিতে পারে নাই।"[৬] পন্ডিতদের অনুমান, অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী নিম্নস্তরের জনজাতি আর্য সমাজের প্রাপ্ত ভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সমাজে মঙ্গল দেব-দেবীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গল সাহিত্য রচনায় কবিরা মনোযোগী হয়। এসব ঘটনার পিছনে রাষ্ট্রিক বিষয়ের সাথে সাথে সামাজিক বিষয়ও বিশেষভাবে কাজ করেছিল। এই ঐতিহাসিক ঘটনা হল বাংলাদেশে তুর্কি আক্রমণ এবং তুর্কি শাসনের প্রারম্ভ। তার প্রেক্ষাপটেই কিন্তু মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা আর্যসমাজে এবং বাঙালি সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বাংলাদেশে তুর্কিরা আক্রমণ করলে বাঙালির সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও সাহিত্যে যে পরিবর্তন ঘটেছিল তারই একটি ধারায় মঙ্গলকাব্যগুলির বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা। বিশ্বের ইতিহাস বলে কোনো রাজনৈতিক বিষয় তখনই পূর্ণতা পায়, যখন বিজিত জাতির উপর ধর্ম, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিজয় লাভ করা যায়।

বাংলার সাধারণ অনার্য জনজীবন ইসলামীয় বিধিব্যবস্থার নিকট সমর্পণ করল। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গ সংস্কৃতিতে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব হল এবং সচেতন হতে দেখা গেল উচ্চকোটির বাঙালি ব্রাহ্মণ্য নেতৃত্ব।

ধর্মীয় সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের সেই সূত্রপাত। উচ্চকোটির আর্য সংস্কৃতির বাহকদের পাশে নিম্নকোটির অনার্য প্রতিনিধিরা দাঁড়ালেন। সুকুমার সেনের মতে –"বাঙ্গালা দেশে আর্য্য অনার্য্য এই দুই স্তর পরস্পরের মিলনকল্পে তুর্কী অভিযান-রূপ প্রচন্ড সংঘর্ষের অপেক্ষা করিতেছিল। ইহাই বাঙ্গালা দেশে তুর্কী অভিযানের সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ। মুসলমান শক্তির মধ্যস্থতায় আর্য্য ও অনার্য্যের মিলন হইয়া বাঙ্গালী জাতি তাহার বিশিষ্টরূপ পাইয়া জন্মগ্রহণ করিল।"[ii] এভাবে আর্য - অনার্য, উচ্চকোটি-নিম্নকোটি, ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ আপন অস্তিত্ব রক্ষার্থে একদিকে যেমন সম্মিলিত হল অন্যদিকে অপৌরাণিক, অনার্য লোকদেবীর আর্যীকরণ ঘটল।

বলা যায় এই ধরনের ধর্মীয় প্রতিরোধ এবং সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর অংশ মঙ্গলকাব্য ধারা।

মধ্যযুগের যে সাহিত্য ধারাটি ক্রমবদলের মধ্য দিয়ে গিয়েও নিজ মহিমা বজায় রেখেছিল, সেটি হল 'ধর্মমঙ্গল'। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের প্রধান দুই কবি ছিলেন - ঘনরাম চক্রবর্তী ও মানিক গাঙ্গুলি। বাকী লেখকরা তাদের গ্রন্থে তেমন নতুনত্ব দেখাতে পারেননি।

ধর্মমঙ্গল ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যসূচক কাব্যধারা। ধর্ম ঠাকুর মূলত অনার্য দেবতা এবং সূর্য কিংবা বুদ্ধের প্রতিরূপ হিসেবে কল্পিত। প্রাচীন বঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে এঁর উদ্ভব। সতেরো শতকের পূর্ব পর্যন্ত এতে কোনো আর্য প্রভাব পড়েনি এবং আর্য পুরাণে ধর্মের কথাও উল্লেখ নেই। সতেরো শতকের পরে যুগপরিবর্তনের সন্ধিক্ষনে ধীরে ধীরে পৌরাণিক ধর্মাদর্শের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ধর্মঠাকুর পৌরাণিক দেবতার পর্যায়ভুক্ত হয়।

ধর্মমঙ্গলের প্রচলিত কাহিনী লাউসেনের সংগ্রামী জীবনের কথা। রামপালের পুত্র যখন গৌড়ের রাজা তখন তাঁর শ্যালক মহামদ পাল ছিলেন রাজমন্ত্রী। আর এই মহামদের ভগ্নী রঞ্জাবতীর সঙ্গে বৃদ্ধ সামন্তরাজ কর্ণসেনের বিবাহ হয়। এদের পুত্রের নাম লাউসেন। লাউসেনের সঙ্গে মহামদ ও ইছাই ঘোষের দ্বন্দ্ব, ধর্মের কৃপায় দ্বন্দ্বে লাউসেনের বিজয়। পরে লাউসেনের অনুরোধে ধর্ম কর্তৃক মহামদের কুষ্ঠ ব্যাধি নিরাময় এবং সবশেষে ধর্মপূজার মধ্য দিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর মধ্য দিয়ে জানা যায় ধর্মমঙ্গল কাব্যের তৎকালীন সমাজ কাঠামো। ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রথম পরিচয় পেয়েছি ষোড়শ শতকে ময়ূরভট্টের কাব্যের মধ্য দিয়ে। পরে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ধর্মমঙ্গলের পরিচয় বিভিন্ন কবির লেখনীতে পাওয়া যায়। এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় কাব্য কাহিনী থেকে তৎকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যযুগের সমাজ - সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার বৈচিত্র্য অন্বেষণ।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের নানান সামাজিক আচার রীতি-নীতি উল্লেখ আছে। এই কাব্যে বিবাহ সংক্রান্ত নানা বিধি নিষেধ ছিল যেমন পৌষ মাস, ভাদ্রমাস, চৈত্রমাসে বিবাহ করা যেত না। আবার কেউ মারা গেলেও বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। ঘনরামের কাব্যে দেখা যায় -

"নিরানন্দ হৈল দ্বন্দ্বেমনোবদ্ধ সব।
বিবাহ মঙ্গল কার্য্য মহামহোৎসব॥
অশৌচান্তে পৌষমাস করে শুক্রবৃদ্ধি।
অতিচারে বৃহস্পতি পরে কালাশুদ্ধি॥
শ্রীহরি-শয়নে বিভা অনুচিত প্রায়।
বৎসরেক বিবাহ বিলম্ব কর রায়॥"[iii]

এরপর তৎকালীন সমাজের নানান লোকানুষ্ঠানের উল্লেখ রয়েছে। ধর্মমঙ্গলের কবিগণ সমাজ অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে তা আখ্যানে প্রকাশ করেছেন। জন্মসংক্রান্ত লোকাচার - সন্তান জন্মের পূর্বে মাতাকে গর্ভাবস্থায় সাধ খাওয়ানো আর উপহার দেওয়ার রীতিও ছিল। আবার সন্তানের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করে গর্ভাবস্থায় ঘি, মধু, দই, দুধ ও চিনি-পঞ্চমৃত খাওয়ানোর প্রচলনও ছিল। যেমন-

"পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত সোমঘোষ দিল।
পরম কৌতুকে রাণী আপনি খাইল॥"[iv]

তেমনি সন্তান জন্মের পর নানা রীতি নীতি পালনের প্রথা ছিল। যেমন-নাড়িকা ছেদন, ষষ্ঠীপূজা, আটকলাই, নামকরণ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি।

এছাড়াও ধর্মমঙ্গলে শিশুর হাতেখড়ি অনুষ্ঠানের পরিচয়ও পাওয়া যায়। এই অনুষ্ঠানটির দ্বারা শিশুর বিদ্যারম্ভ করানো হত। হাতে খড়ির প্রসঙ্গ এসেছে লাউসেন ও কর্পূরের হাতেখড়ির সময় -

"পঞ্চম বৎসর প্রাপ্ত হত্যে শুচিপক্ষে।
বিদ্যারম্ভ বালকের কৈল উক্ত ঋক্ষে॥"[v]

জন্মসংক্রান্ত লোকাচারের পর ধর্মমঙ্গলে উঠে এসেছে নানান বৈবাহিক জীবনের আচার অনুষ্ঠান। এই আখ্যানে গায়ে হলুদ, অধিবাস, মঙ্গলসূত্র বন্ধন, নান্দীমুখ,ক্ষৌরকর্ম, বরণ করা, মালাবদল, সাতপাক, সম্প্রদান, বাসরঘর, কন্যা বিদায়, বধূবরণ ইত্যাদি বৈবাহিক রীতি পালিত হত।

"উল্লাস বাজনা বাজে আসন উপরে।
শশিমুখী সকলে বরিতে এল বরে॥
কোন নব নাগরী লাবণ্য দেশ ব্ই।
কপালে চন্দন দিয়ে পায়ে ঢালে দ্ই॥"[iv]

ধর্মমঙ্গল কাব্যে কোথাও সরাসরি পণ দেওয়ার উল্লেখ না থাকলেও, বরকে যে যৌতুক দেওয়া হত তার উল্লেখ পাওয়া যায়। লাউসেনের বিবাহে কাঙুররাজকে উপহার দিতে দেখা যায় -

"জামাতাকে যৌতুক যতনে দিল ভূপ।
বাস ভূষা বহু রত্ন বিষয়ানুরূপ॥
কন্যাকে যৌতুক দিল কত রত্ন ধন।
কালিনি পাখর ঘুড়ি কাঞ্চন ভরণ॥
দিল আর দুই দাসী দক্ষিণা দ্রৌপদী।
সারিল সকল ক্রিয়া শেষে যথাবিধি॥"[vii]

এই আখ্যানে মৃত্যুকালীন আচার পালনের রীতি ছিল। যেমন-মৃতদেহ সৎকার, অস্থি বিসর্জন, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। তৎকালীন সময়ে মৃতদেহর দাহ কার্য সম্পন্ন হত

নদীর ধারে বা শ্মশানে। আর অভিজাত ব্যক্তিরা চিতায় ঘি ঢেলে দাহ কার্য সম্পন্ন করত তার উল্লেখ্ও পাওয়া যায়। অপুত্রক ইছাই ঘোষ যখন মারা যায় তখন তার দাহ কার্য সম্পন্ন করে তার মাতা পার্বতী। এর থেকে বোঝা যায় মধ্যযুগে পুত্রের চিতায় মাতার অগ্নিসংযোগের অধিকার ছিল -

"পদ্মার বচনে মাতা প্রয়বোধ মানি।
ইছায়ের অগ্নিকার্য করেন আপুনি॥"[viii]

বাঙালি জাতির আচার-আচরণ, সংস্কার ইত্যাদি বিষয় দ্বারা বাঙালি জাতির স্বরূপ ও সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে অবগত করায়। বাঙালি জাতি যে উৎসব প্রিয় মানুষ তার উল্লেখ্ও ধর্মমঙ্গলে রয়েছে -

"আশ্বিনে অম্বিকে পূজা অষ্টলোকে করে।
গঙ্গাজল বিল্বদল নানা উপচারে॥
কেহ বা প্রতিমা করে কেহ আনে পট।
গরিব কাঙ্গাল যারা তারা আনে ঘট॥"[ix]

মধ্যযুগীয় সমাজে বলিপ্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়।

"শঙ্খ ঘন্টা সুনা দিতে বাজে অনিবার।
জগৎ সংসার জুড়ে জয় জয়কার॥
খমক খঞ্জরি বাজে ঝর্ঝরি নিসান।
মেষাদি মহিষ কেটে দেয় বলিদান॥"[x]

আবার এই গ্রন্থে সারা বছর ধরে কোনো না কোনো ব্রতানুষ্ঠান পালন করতে দেখা যায়।

এতে খাদ্যাভাস বিষয়েও নানা বিবরণ রয়েছে। কোন দিনে, কোন বারে, কোন তিথিতে কোন মাসে কী কী খাবার গ্রহণ করা উচিত আর অনুচিত তা নিয়েও নানা বাধানিষেধ রয়েছে। যেমন - ধর্মঠাকুর যখন রঞ্জাবতীকে পুত্র প্রাপ্তির আশীর্বাদ দেয় তখন ধর্মঠাকুরের কথায় খাদ্যাভাসে নিষেধের কথা উঠে আসে -

"লাউ নাঞী খায়্য রঞ্জা লাউ নাঞী রুয়্য।
পুত্র হৈলে নাম তার লাউসেন থুয়্য॥"[xi]

বিদ্যাশিক্ষা মধ্যযুগীয় সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তৎকালীন মধ্যযুগীয় সমাজে বাল্যকালেই বিদ্যারম্ভ হত। পাঁচ বছর বয়সে শিশুর হাতেখড়ি হত। লাউসেনের বিদ্যাশিক্ষা নিয়ে ঘনরাম চক্রবর্তী বলেছেন -

"আরম্ভ করাল্য বিদ্যা হাতে দিয়া খড়ি
অকারাদি ক্ষকারান্ত যে যে বর্ণগুলি।
ক্রমিক হ্ইতে ভূমে লেখাইল সকলি
বরপুত্র ধর্মের ধীষণাবান হয়।
অনায়াসে দিন দশে বর্ণপরিচয়॥"[xii]

তৎকালে ব্যাকরণ পাঠে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। আর পাণিনির ব্যাকরণের গ্রহণযোগ্যতা অধিক ছিল।

মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় একদিকে জ্ঞানের বিকাশ ঘটলেও অন্যদিকে তুক-তাক, ঝাড়ফুঁক, বশীকরণের মতো কুসংস্কারের প্রতি মানুষের আকর্ষণ্ও দেখা যায়। ইন্দেমেটে লাউসেনকে চুরি করার আগে দেবী কালিকার কাছে আশীর্বাদ চেয়ে বলে -

"নগরে না হবে বিঘ্ন লাগিবে নিদুটী।
কেহ যেন না জাগে নির্ভয়ে সিঁদ কাটি।"[xiii]

ধর্মমঙ্গল কাব্যে বহুবিবাহের পাশাপাশি বাল্যবিবাহের প্রথাও ছিল। যেমন- লাউসেন, কালুডোমের বিবাহ থেকে বহুবিবাহ আর কর্ণসেন ও রঞ্জাবতীর বিবাহ থেকে বাল্যবিবাহর পরিচয় পাওয়া যায়।

উপসংহার: সবমিলিয়ে মধ্যযুগের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যটি কেবলমাত্র ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারমূলক গ্রন্থ নয়, এটি মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থার সংস্কৃতি,জীবনচর্চা, সমাজ ইতিহাসের আকর গ্রন্থ। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে এসে মধ্যযুগীয় সমাজ জীবনে বিস্তর পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। আর তার প্রভাব মধ্যযুগীয় সাহিত্যেও পড়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাঢ় বঙ্গের সমাজ সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রায় যে পরিবর্তন এসেছিল তা নানা তথ্য এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে।

Bibliography

1. সেন, সুকুমার:বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রকাশক - শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১০নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
2. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খন্ড, প্রকাশক- শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, ১ম সংস্করণ ১৯৬০।
3. সেন, শ্রীসুকুমার ও মন্ডল, শ্রীপঞ্চানন(সম্পাদিত): রূপরামের ধর্মমঙ্গল(১ম খন্ড), সাহিত্য সভা, বর্দ্ধমান ১৩৫১, মুদ্রাকর-শ্রীত্রিদিবেশ বসু বি.এ,কে.পি বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১১ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা।
4. দত্ত, শ্রীবিজিতকুমার ও দত্ত, শ্রীসুনন্দা (সম্পাদিত): মানিকরাম গাঙ্গুলি বিরচিত ধর্মমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬০, মুদ্রক: শ্রীগোপালচন্দ্র রায় নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩।
5. চক্রবর্তী, ঘনরাম (প্রণীত): শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ৩৮/২ ভবানীচরণ দত্তের স্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন প্রেসে শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, সন ১৩১৮ সাল।
6. হালদার, গোপাল: বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, ১ম খন্ড, প্রকাশক- শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখ্যোপাধ্যায়, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২।

Endnote

I. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খন্ড)-অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ-৬৪
II. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-সুকুমার সেন, পৃ-৫৫
III. ঘনরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত-শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, পৃ-১৬০
IV. রূপরামের ধর্মমঙ্গল (১ম খন্ড) - শ্রীসুকুমার সেন ও শ্রীপঞ্চানন মন্ডল (সম্পাদিত), পৃ-৪৬
V. মানিকরাম গাঙ্গুলি বিরচিত ধর্মমঙ্গল- শ্রীবিজিতকুমার দত্ত ও শ্রীসুনন্দা দত্ত (সম্পাদিত), পৃ-৫৮
VI. ঘনরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত- শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, পৃ-২৪
VII. মানিকরাম গাঙ্গুলি বিরচিত ধর্মমঙ্গল-শ্রীবিজিতকুমার দত্ত ও শ্রীসুনন্দা দত্ত (সম্পাদিত), পৃ-৩৪৯
VIII. মানিকরাম গাঙ্গুলি বিরচিত ধর্মমঙ্গল- শ্রীবিজিতকুমার দত্ত ও শ্রীসুনন্দা দত্ত (সম্পাদিত),পৃ-৪৬৬
IX. মানিকরাম গাঙ্গুলি বিরচিত ধর্মমঙ্গল-শ্রীবিজিতকুমার দত্ত ও শ্রীসুনন্দা দত্ত (সম্পাদিত), পৃ-১২৪
X. মানিকরাম গাঙ্গুলি বিরচিত ধর্মমঙ্গল- শ্রীবিজিতকুমার দত্ত ও শ্রীসুনন্দা দত্ত (সম্পাদিত), পৃ-১২৪
XI. রূপরামের ধর্মমঙ্গল (১ম খন্ড) - শ্রীসুকুমার সেন ও শ্রীপঞ্চানন মন্ডল (সম্পাদিত), পৃ-১০৪
XII. মানিকরাম গাঙ্গুলি বিরচিত ধর্মমঙ্গল- শ্রীবিজিতকুমার দত্ত ও শ্রীসুনন্দা দত্ত (সম্পাদিত), পৃ-১১৪
XIII. ঘনরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত- শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, পৃ-৫৪